**This book is part of the
Carey Library and Research Centre
at Serampore College.**

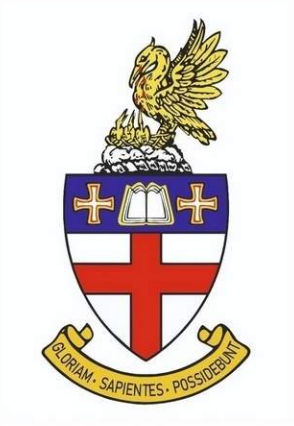

**This is a reproduction of a library book
that was digitized at the CLRC,
Serampore.
The information in this book is freely
available to the public and can be
quoted with proper reference.**

The use of this document may be subject
to the Copyright Law of India or to
site license or other rights management
terms and conditions. The person
using this document is liable for any
infringement.

বাংলা গদ্য পুঁথি

শ্রীরামপুর কলেজের আলোচনা সভায় পঠিত প্রবন্ধাবলীর সংকলন

কেরী গ্রন্থাগার
শ্রীরামপুর কলেজ
২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২

দুশ বছরের পুরানো বাংলা গদ্য পুঁথি

ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডানকান, এডমনস্টোন ও ফরস্টারের চারখানি বই বাংলায় আইন অনুবাদের সূত্রপাত করে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের বাংলা গদ্যের তুলনায় ডানকান এডমনস্টোন ফরস্টারের গদ্য ন্যূন নয়। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উন্নত। গদ্যের গুরু ভারবহনক্ষমতা ও জটিল চিন্তাবাহন হবার সামর্থ্য এখানে পরীক্ষিত হয়েছে। কেরী-মৃত্যুঞ্জয়-রামনাথ-রাজীব-লোচন-গোলকনাথ-চণ্ডীচরণ-তারিণীচরণ-হরপ্রসাদ-কাশীনাথ-পদ্মলোচন-রামরাম প্রমুখ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যলেখকের কীর্তির তুলনায় ডানকান এডমনস্টোন্ ফরস্টারের কীর্তি ও সাফল্য নিতান্ত অল্প নয়। একথা স্বীকার্য, কেরীর 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' (১ম সং ১৮০১, ২য় সং ১৮০৫, ৩য় সং ১৮১৫, ৪র্থ সং ১৮১৮, ৫ম সং ১৮৪৩), 'কথোপ-কথন' (১৮০১), 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) আধুনিক বাংলা গদ্যের মাইলস্টোন। শ্রীরামপুর মিশনে কেরী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ (টমাস, মার্শম্যান, ওয়ার্ড) বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেন। স্বীকার্য, এইসব অনুবাদ ইংরেজি বাক্যবন্ধের অন্ধ অনুসরণমাত্র, তার প্রকাশভঙ্গি আড়ষ্ট। আরো স্বীকার্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখক-গোষ্ঠীর সামনে গদ্যের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না তাঁদের গদ্য-চর্চায় ছিল না কোনো আন্তরিক প্রেরণা, চাকুরিজীবনে কেরী সাহেবের নির্দেশ ছিল একমাত্র সম্বল। শ্রীরামপুর ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর লেখকদের সুষ্ঠু গদ্যরচনায় প্রধান বাধা ছিল তিনটি—

"(১) শব্দ-নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা, (২) দূরান্বয়ের জন্য বাক্যাংশসমূহে পারস্পরিক সম্বন্ধবোধে অনিশ্চয়তা, (৩) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য নিরূপণে সুমিতিহীনতা।" (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা,' খণ্ড ২, অধ্যায় ১)।

এই প্রয়াস ও ব্যর্থতার পাশাপাশি ডানকান এডমনস্টোন ফরস্টারের প্রয়াসের মূল্য নিরূপণ করা যেতে পারে।

(১) ডানকানের অনুবাদ (১৭৮৫)—

"মপস্বল দেওয়ানি আদালত সকলের ও সদর দেওয়ানি আদালতের বিচার ও ইনসাফ চলন হইবার কারণ ধারা ও নিয়ম—

১৯ উনবিংশতি ধারা

জমিদারি ও তালুকদারি ও চৌধুরাই ও বাটী ও ভূমির মিরাসের বিষয় যেখানে একজন না হইয়া অধিক অংশী হয় তাহারা আপন ২ জাতির শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থামতে অংশ পাইবেক এমত প্রকারের বিষয়ে অংশির দিগের অনুমতিক্রমে ব্যবস্থামতে যাহার যে অংশ পাওনা হয় প্রত্যেকে সকলের নামে দিক্রি করিতে হবেক ইহার অন্যমত করিতে না পারিবেণ—"

(১) এডমনস্টোনের অনুবাদ (১৭৯১)—

"সকল ফেরবার লোককে রক্ষা করা হাকিমের কর্ত্তব্ব কর্ম্ম বিশেষত তাহাদিগে জাহারা সহজেই দুষ্ব পেয়ার তালুকদারান ও রায়ত লোক ও আর খেত আবাদ করণ ওালা দিগের ভালর নিমিত্থে ও রক্ষা করিবার নিমিত্থে নবাব গবর্ণর জানরেল বাহাদুর জখন মনাছেন বুঝেন আইন করিবেন।"

(২) ফরস্টারের অনুবাদ (১৭৯৩)—

"হাকীমের উচিত জে ছোট বড় সকল লোকের বিশেষতঃ দুস্থ ও গরিবদিগের রক্ষা নিয়ত করেণ অতয়েব ঐ শ্রীযুত সকল মফস্বলী তালুকদার ও প্রজা প্রভৃতি চাসী লোকদিগের কল্যাণ ও কুশলের নিমিত্ত যে কালে যে আইন করণ উচিত জানেন সেকালে তাহাই নির্দ্দিষ্ট করেণ কিন্তু এমত সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইবাতে কোনপ্রকারে জমীদার ও হুজুরী তালুকদার প্রভৃতি ভূম্যাধিকারীদিগের শিরে যে

মোকররী জমার ধার্য্য রহে তাহা দিবার বিষয়ে তাহারদিগের কিছু আপত্য ও ওজর হইবেক না।"

এই তিনটি গদ্য-নিদর্শনের রচনাকাল ১৭৮৫ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। ডানকান ও ফরস্টারের গদ্য অপেক্ষাকৃত সরল, পক্ষান্তরে এডমনস্টোনের গদ্যভাষা ফারসীবহুল ও আড়ষ্ট। আমরা জানি, ফারসীবহুলতা সেকালের বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তা হালহেড ও ফোর্ট উইলিয়ম গোষ্ঠীর কোনো কোনো লেখকের রচনায় অনায়াস-লক্ষণীয়। গদ্যের আসল পরীক্ষা বাক্যের সংগঠনে—পদান্বয় কৌশলে, বাক্যাংশগুলির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায়। এই পরীক্ষায় ডানকান ও ফরস্টার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন নি। ডানকান ও ফরস্টারের গদ্য-নিদর্শনে বিরামচিহ্নের প্রয়োগবিরলতা সহজেই চোখে পড়ে। সেদিন তার প্রয়োগ বিশেষ ছিল না। কিন্তু এই গদ্যাংশ পাঠে আমাদের খুব-একটা অসুবিধা ঘটে না। বাক্যাংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধবোধে কোনো অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্যস্বীকার্য, সমগ্র বাক্যের দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য-নিরূপণে সুমিতির অভাব আছে।

আমরা জানি, আইনের ভাষা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার। সাজ-সজ্জার বহুলতা এখানে বর্জনীয়। এখানে চাই স্পষ্টতা, যাথার্থ্য, সারল্য, ভারসাম্য। ডানকান ও ফরস্টার গদ্যের এই দুরূহ আদর্শের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন, যদিও সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

এই পটভূমিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষা বিভাগের পুথি-শালায় রক্ষিত একখানি গদ্য-পুথির (সংখ্যা ৪০৫২) প্রতি সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় রেগুলেশনের সমকালীন বাংলা অনুবাদ এই পুথির বিষয়বস্তু। পুথিখানি তুলট কাগজে লেখা। মোট আটটি পাতা পাওয়া গিয়েছে। প্রতি পাতার আকার ৩৫ সেঃ মিঃ × ২৫ সেঃ মিঃ। প্রতি পৃষ্ঠায় লাইনের সংখ্যা ৩৫।

পুথির বিষয় "ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন"। মোট ৮টি পাতায় উভয়দিকে লিখিত অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠায় পুরানো হস্তাক্ষরে লিখিত A.D. 1793 REGULATION II (Enacted by the Governor General in Council for the Civil Government of the whole of the Territories under the Presidency of Fort William in Bengal) -এর ২৭ ধারা পর্যন্ত অংশের অনুবাদ আছে। সংশ্লিষ্ট আইনের মোট ধারা সংখ্যা ৭০। সংশ্লিষ্ট পুথিতে বাকি অংশ নেই। মনে হয় অন্য অংশেরও অনুবাদ ঐ সঙ্গেছিল। তা হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে। অনুবাদকের কোন নামোল্লেখ নেই। সরকারী প্রয়োজনে পেশাদার অনুবাদক এই কাজ করতেন।

এই অনুবাদে বাংলা গদ্যের গুরুভারবহন ক্ষমতা ও দুরূহ চিন্তা-প্রকাশসামর্থ্য পরীক্ষিত হয়েছে। এখানে রেগুলেশনের একটি ধারা (দশম ধারা) ও তার বঙ্গানুবাদ উদ্ধার করি—

"The Collectors are prohibited from employing directly or indirectly their private servants, whether banyans or others, in the discharge of any part of their public duties, if being required that in all matters relating to the trust combined to them, they act as the only empowered agents of government. This prohibition, is not meant to restrict them from occassionally employing their assistants or dewans, or their inferior public servants, in the cases, and in the manner in which they are authorized to make use of their agency."

"কালেকটর সাহেব দিগের নিসেধ আছে যে, তাহার দিগের নিজের চাকর মুচ্ছদি কল্‌প কিম্বা তদ্‌ভিন্ন লোককে আপনার দিগের

মোতালকের কার্য্য করিতে না দেন (।) এই হেতুক জে কালেকটর সাহেবেরা আপনার দিগের মোতালক যাবন্ত কার্য্য করেন কেবল আপনার দিগেরই সরকারের প্রস্তে কর্ত্তা জানিএ সকল কার্য্য করিতে রহিবেন। কিন্তু এই নিসেধ কালেকটর সাহেবেরা এমত না জানেন জে তাঁহার দিগের এশিষ্টেন্স অর্থাৎ ছোট সাহেবা ও দেওয়ান প্রভৃতি আমলাদিগের যে সকল বিসয়ে কার্য্য করিতে ভার দেবার হুকুম আছে তাহা করিতে ভার না দেন ইতি—॥"

এই বঙ্গানুবাদের ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অনুধাবনযোগ্য।

(১) শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশের অনুবাদ ঃ

public duties = মোতালকের কার্য্য

the only empowered agents of government = কেবল আপনার দিগেরই সরকারের প্রস্তে কর্ত্তা।

collector = কালেকটর (এ কালের মতো 'সমাহর্তা' নয়)।

prohibited, prohibition = নিসেধ (নিষেধ)।

(২) বর্জিত অংশ ঃ

directly or indirectly — এই অংশটি অনুবাদে বর্জিত।

occassionally—অনুবাদে বর্জিত।

(৩) বিরামচিহ্নের (পূর্ণচ্ছেদ) ব্যবহার না থাকলেও মর্মগ্রহণে অসুবিধা হয় না। প্রথম ইংরেজী বাক্যটি কার্যতঃ দুটি বাংলা বাক্যে অনূদিত হয়েছে—(।)-চিহ্নিত অংশে বিভাজিত। দ্বিতীয় ইংরেজী বাক্যটি একটি বাংলা বাক্যরূপেই অনূদিত হয়েছে। বাক্যের ভারসাম্য রক্ষায় অনুবাদকের সচেতনতা ও সামর্থ্য এখানে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত।

(৪) শব্দবন্ধ বা বাক্যাংশ বর্জন এমনভাবে করা হয়েছে যাতে রেগুলেশনের ধারার মর্মার্থ গ্রহণে অসুবিধা না হয়, অথচ মূল বক্তব্য

বাদ না পড়ে। অনুবাদের সর্বজনবোধগম্যতার প্রতি অনুবাদকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এখানে ক্রিয়াশীল।

এই গদ্যভাষায় ডানকানের গদ্যভাষার প্রভাব স্পষ্ট।

এবার আর একটি ধারার (চতুর্দশ) মূল ও অনুবাদ উদ্ধার ও বিচার করা যাক।

"In the event of death, or removal, of a collector, or of his absence from his station, the senior assistant on the spot is to perform the duties of collector, and the dewan and the public officers of the collectorship are accordingly to obey his orders."

"কালেকটর ৺দৈবাধিন মরিলে কিম্বা সাক্ষাৎ না থাকিলে অথবা আপণ কার্য্য হইতে স্থানান্তরে গেলে তথাকার এশিটেন্‌শ অর্থাৎ ছোট সাহেবদিগের মর্দ্দে জে কেহ অগ্রগণ্য থাকেন সেই সাহেব কালেকটীর সকল কার্য্য করিবেন এবং এ প্রকারে দেওয়ান প্রভৃতি আমলারা সেই এশিস্টেন্‌শ সাহেবের তাবে রহিয়া তাহার হুকুমতে বিসয় ব্যাপার চালাইবেন ইতি —"

এই অনুবাদ পাঠে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায় :

(১) সমগ্র বাক্যটির দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য-নিরূপণে সুস্থিতি রক্ষিত হয়েছে। (২) দূরান্বয় না ঘটায় বাক্যাংশ-সমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ-বোধে অনিশ্চয়তা ঘটে নি। (৩) শব্দ নির্বাচনে ও সন্নিবেশে অপটুতা ঘটে নি।

সেদিন (১৭৯০-৯৩ খ্রী) অনুবাদের আদর্শ এখানে অনুসৃত হয়েছে। আক্ষরিক ও সাহিত্যিক (Verbatimet literatim) অনুবাদ তখন অনভিপ্রেত ছিল। তার পরিবর্তে জনসাধারণের বুঝবার উপযোগী করে সম্পূর্ণ ইংরেজী বাক্যটিকে বাংলায় রূপান্তরণ কাম্য ছিল

(Vide Section 18 of Regulation XLI of 1793)। আলোচ্যমান অনুবাদে এই নির্দেশ মান্য করা হয়েছে।

এবার বাক্যাংশগুলির অনুবাদকের বিবেচনার পরিচয় গ্রহণ করি।

In the event of death—'৺দৈবাধিন মরিলে'।

In the event of removal : এখানে অনুবাদক স্বাধীনতা নিয়েছেন—লিখেছেন—'সাক্ষাৎ না থাকিলে'।

In the event of his absence from his station—'আপণ কার্য্য হইতে স্থানান্তরে গেলে'।

the senior assistant on the spot : এখানেও অনুবাদক স্বাধীনতা নিয়েছেন—অনুবাদ করেছেন—'তথাকার এশিটেন্‌শ অর্থাৎ ছোট সাহেবদিগের মর্দ্দে জে কেহ অগ্রগণ্য থাকেন সেই সাহেব'।

the dewan and the public officers = 'দেওয়ান প্রভৃতি আমলার'।

(They) are accordingly to obey his orders—'সেই এশিস্টন্‌শ সাহেবের তাবে রহিয়া তাহার হুকুমতে বিসয় ব্যাপার চালাইবেন।'

এখানেই বাংলা বাক্যের প্রকৃতি অনুযায়ী অনুবাদক কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা নিয়েছেন। সর্বজনবোধগম্যতা ও সর্বজনব্যবহারযোগ্যতা অনুবাদের সার্থকতার দুটি বিশিষ্ট লক্ষণ। সেদিক থেকে এই অনুবাদ সার্থক, একথা স্বীকার্য।

অপেক্ষাকৃত জটিল একটি ধারা (চতুর্বিংশ ধারা) গ্রহণ করা যাক।

"The collectoas are prohibited deputing any person into the Zillah of any othe collector, or excercising any authority beyond the limits of their respective Zillahs, excepting in cases in

which they may be authorised so to do by a regulation published in the manner directed in regulation XLI, 1793, or by special orders from a competent authority."

"কালেকটর সাহেব দিগের কর্ত্তব্য নহে জে ইঙ্গরেজি ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের মতে জে কোনো আইন প্রকাশ হয় তদনুসারে অথবা জে স্থানে হইতে তাঁহার দিগের প্রতি হুকুম হইতে পারে তথাকার সিরিস্তাক্রমে [*] বিস-এর হুকুম থাকে তাহা ছাড়া বিসয়ান্তরে আপনার [*] তরফ কাহাকেও অন্য জেলায় তৈনাত করেন কিম্বা আপনার [*] মোতালক সীমা সরহদ্দের মধ্যে যে হুকুমত চলে তা না চলান ইতি ।—"

এই অনুবাদে বাক্যের দৈর্ঘ্য ও ভারসাম্য-নিরূপণে অনুবাদক পটুতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজী বাক্যের পদান্বয়ের অন্ধ অনুকরণ না করে মূল অংশকে দীর্ঘ বাক্যের শেষে এনেছেন ও গৌণ অংশকে—বাক্যাংশসমূহকে -গোড়ায় রেখেছেন। তার ফলে ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। তিনটি ছিন্নাংশ সত্ত্বেও অনুবাদের সাবলীলতা বোধগম্য হয়। বাক্যাংশের অনুবাদে পটুতার পরিচয় আছে। limits of their respective হয়েছে 'জেলার সীমা-সরহদ্দের মধ্যে', exercising any authority হয়েছে 'যে হুকুমত চলে', deputing any person into the Zillah of any other collector হয়েছে 'আপনার তরফ কাহাকেও অন্য জেলায় তৈনাত করেন।'

এই পুথির হরফ পুরনো ধাঁচের। হরফগুলির কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য :

ন, ল-এ প্রায় অভেদ। র হরফ কখনো ব, ব। ক্র=ক্র, ক্র=ক্র। 'ক' হরফে স্বাতন্ত্র্য আছে। ত্ত=তু, যেমন নতুবা=নত্তবা।

অনুস্বার বোঝাতে হরফের উপর একটি বিন্দু ০ = ং। অন্তঃস্থ ব বোঝাতে ওআ-শব্দের ব্যবহার, যেমন, জবাব হয়েছে জওবাব।

ছেদচিহ্নের ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই কম। পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া আর কোনো ছেদচিহ্ন নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাও নেই।

হাতে-লেখা পুথিতে যে অনিবার্য অশুদ্ধ বানান তা এ'পুথিতেও আছে। অশুদ্ধি দুরকমের—বানানে বিকৃতি ও শব্দগঠনে বিকৃতি। একই শব্দের দু'রকমের বানান আছে। তৎসম শব্দের বানানে শৈথিল্য খুব বেশি রকমের। এই পুথিতে ব্যবহৃত দু'রকমের বিকৃতির দুটি তালিকা এখানে দেওয়া গেল।

বানানে বিকৃতি :

অসিদ্দী, অনূসারে, উভএর, কর্তৃ'ত্ত, কর্ত্তাব্য, চাশ, চাস. বিক্ষাত, বৈসাখ, শশ্য, স্বত্ত, বিসএ, জে. প্রভৃতি, সক্তি, গূরূতর, জদি, জাএন, জায়, জাবদিয়, ভাসা (ভাষা). সম্পক্কীয়, ভূমী. নিস্কর, মাষ (=মাস) পিড়া, পার্থ্যক্য, চিটী, নদি, সষ্ঠ. মোনোনিবেস, নিযুক্ত, নিসেধ, পদাভিশিক্ত, তাহারদিগোর, খায (=খাস), বেক্তি।

শব্দে বিকৃতি :

আপত্য (=আপত্তি), অধিক্য, আধিক্যাধিন, স্থর্য্যতা, প্রস্তাপিত, মনাস্থর, ছারা, যাবন্ত (=যাবৎ), স্বেৎসা (=স্বেচ্ছা), গ্রস্থ (=গ্রস্ত), নিষ্পত্য (=নিষ্পত্তি), প্রবত্ত (প্রবৃত্ত), পারসী (ফার্সী), মতস্থর্য্য, মসাহেরা (=মাসোহারা), প্রকত (=প্রকৃত), স্থর (=স্তর), বিত্তি (=বৃত্তি), মুছুদ্দি (=মুৎসুদ্দি), মাস ২-এ (=মাসে মাসে)।

---

[*] ছিন্ন অংশ

এই পুথিতে ব্যবহৃত ফার্সী শব্দ :

আদালত, ইজারা, দেওানি (=দেওয়ানি), সুকা (সুখা), মতালক, সিরিস্তা, তহশীল, তহশীলদারী, বিলায়েত, ওয়াজিব, হাসিল, হাশীল, বাহাল, গয়রহ, সেওায় (=সিবা=ছাড়া), জমীদারান, হুজুরি তালুকদারান, খাজাঞ্চী, বরাৎ বরাতি, মোকররী জমা, মালগুজারী, হরজমরজ, দিগর, খতরা, মফস্বল, সরহদ্দ, লোকসান, তগীর (=dismiss), তাগাবি (=advance).

এই পুথিতে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দ :

গবনর জানেরেল বাহাদুর কঙসলে, শ্রীযুত কোম্পানী ইঙ্গরেজ বাহাদুর, কালেকটর, বোর্ডের রিবিনিউ, রিবীনিউ, কোর্ট আফ (আপ) ওয়াজ, টেক্স, জজ, এশিটেন্‌শ সাহেব এক্ট, পালেমেণ্ট।

এই পুথি পাঠে জানা যায়, সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় কালেক্টর-মোহরে ব্যবহৃত ভাষা ছিল ফার্সী ও বাংলা (দ্রষ্টব্য : ৫ ধারা), সুবে বেহারে কালেক্টর মোহরে ব্যবহৃত ভাষা ছিল ফার্সী ও নাগরী (দ্রষ্টব্য : ৫ ধারা)। আরো জানা যায়, কালেক্টরের রোজনামচা লেখা হ'ত ইংরেজী বা ফার্সী বা বাংলায় (দ্রষ্টব্য : ৬ ধারা)। দুএকটি শব্দ ব্যবহারের প্রতি পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ৮ ধারার দ্বাদশ প্রকরণে লেখা আছে— 'পুলিস অর্থাৎ থানাবন্দি'। ১২ ধারায় নির্দেশ আছে, খাজনা ও ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার ব্যবহার করতে হবে। এই অর্থে প্রয়োগ—'সে স্থানের চলন ভাসা' (=ভাষা)।

বাংলা গদ্য পুঁথি—একটি সমীক্ষা

—ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ

বাংলা গদ্য পুঁথির সংখ্যা খুবই অল্প। এই স্বল্পতার কারণ প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ পুরানো বাংলা সাহিত্যের বাহন ছিল পয়ার ছন্দ। এই অসাধারণ নমনীয় ও শোষণশক্তি সম্পন্ন ছন্দে মানবিক অনুভূতি ও আবেগ যেমন অনায়াসে প্রকাশ করা যায়, তেমনি তত্ত্ব ও যুক্তিমূলক ভাবকেও প্রকাশ করা যায়। তাই একদিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত মানবিক অনুভূতি ও আবেগ সম্বলিত বইও ঐ ছন্দে লিখিত হয়েছে, আবার অপরদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের দুরূহ বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্বকেও ঐ ছন্দেই প্রকাশ করা গিয়েছে। এমনকি আয়ুর্বেদ গ্রন্থও বাংলা পয়ারের বন্ধন স্বীকার করেছিল। তাই অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি বললেই চলে। দ্বিতীয় কারণ হ'ল বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস। যে ভাষায় আমরা দৈনন্দিন প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি প্রকাশ করি, সাধারণ কথাকাটাকাটি করতে যার ইতরজনোচিত ব্যবহার করি, যা নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্রের ন্যায় কলংকসৃষ্ট ও ধূলিমলিন তাকে আবার মেজে ঘষে সাহিত্যিক দেবপূজায় নিয়োগ করা যায়, তার ভেতর দিয়ে উচ্চাঙ্গের প্রকাশ ক্ষমতা ও সাহিত্যের অম্লান দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে পারে এ সম্ভাবনা বহুদিন পর্যন্ত লেখকের মনে উদয় হয়নি। তাই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক পর্যন্ত পদ্যই বাংলা সাহিত্যের প্রায় একক বাহন ছিল। গদ্য মানুষের মুখ থেকে আর সাহিত্যের আসরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

এইসব সত্ত্বেও বাংলা গদ্যে যে সাহিত্য রচনা হত তার প্রমাণ পাই বৈষ্ণবদাসের 'কবি বন্দনায়'। সেখানে তিনি বলছেন :—

জয় জয় চণ্ডীদাস রস শেখর
অখিল ভুবনে অনুপম ॥
যাকর রচিত মধুর রস নিরমল
গদ্য পদ্যময় গীত।

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম যে লিখিত নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা হ'ল ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্তৃক অহোমরাজকে লেখা একখানি চিঠি। এই চিঠির ভাষা আধুনিক বাংলা ভাষার ন্যায় না হলেও বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। এথেকে বোঝা যায় যে লিখিত গদ্যের অনুশীলন দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। তা না হলে ঐরকম ভাষায় চিঠি লেখা সম্ভব নয়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল যে, লিখিত বাংলা গদ্যের এই প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়ে প্রধানতঃ শাসন তথা আইন সংক্রান্ত বিষয়বস্তু নিয়ে।

এর পরবর্তী যে বাংলা গদ্যের নিদর্শন পাই সেটিও একটি চুক্তি-পত্র। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে কৃত এই চুক্তিপত্রটি নিম্নরূপ :—

"শ্রীকৃষ্ণ / সাধি শ্রী ধর্ম্ম

শ্রীযুত মিত্রি গাই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু—
লিখিতং শ্রীকৃষ্ণদাস ও নরসিংহ দাস আগে আমরা দুই লুক করার করিলাম জে কিছু পরে সুনারগায় ও গর বিকরি সকরাত ২ দুই রূপাইয়া করিয়া আরও দালালি লইব আর কুন দায়া নাই খুরাক সমেত এই নিআমে করা পত্র দিলাম স ১১০৩ তে ১৪ আগ্রান।'

এরও পূর্বে শ্রীহট্টে প্রাপ্ত ১৬১৯ খৃষ্টাব্দের কিছু তুলট কাগজে লেখা বাংলা গদ্য আমরা পেয়েছি। মোট ১৬ পৃষ্ঠা। এটি প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লিখিত। এর নাম "তজকিরা চৌধুরাই"। তজকিরা অর্থে স্মারকলিপি। এর ২য় পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কেবল গ্রামের নাম। প্রথম পৃষ্ঠায় যে সামান্য বিবরণ আছে তার কোনরকম সাহিত্যিক বা ভাষাগত মূল্য নেই বললেই চলে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য পুঁথি হল কাছাড়ের রাজা কীর্তি চন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত দুখানি সনদ। এর ভাষাগত উদাহরণের কারণে একটি উল্লেখ করা হল :—

" শ্রী গম ।

৺ স্বস্তি : প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবানল শলভিকৃত বৈরী নিকর শরদিন্দু সন্দর জন হেড়ম্বপুর পুরিত পুরন্দর শ্রী শ্রীযুক্ত কীর্তি-চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা মহমহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

অভয় পত্র লিখনং

মিদং কার্জাঞ্চ –

আর বড়গলার চান্দগা লস্করর বেটা মণিরামরে আমি জানিয়া কাচারির নিআমে উজির পাতিলাম এতে অখন অবধি তুমার উজিরর বেটা ও নাতি ও পরিনাতি তার ধারা সূত্রক্রমে এই উজির হৈআ জাইব আর মজুন্দারের বেটা মজুন্দার হৈব আর বড় ভুইআর বেটা বড় ভুইআ হৈব এতধর্থে অভয় দিলাম এতে কাল কাদাল কুনদিন এই বাক্য দড় কুন জনে না ভাড়িব আর চতুরাসিমা পর্ব্বে বল্লা হাহর ও আভঙ্গ পশ্ছিমে তাহিরর পচ্ছিমর সিমা এই তাহিবরে বড়গলার জাবরে দিলাম এতে কুন শন্দেহ না আছে আর রাজ্যর মনুশ্য জে জনে উজিবর বাক্যে না চলে মেল দেযান হেলা করিআ (আকুষ্ট) সর্বদণ্ড করিমু এতদর্থে অভয়পত্র দিলাম ইতি শক ১৬৫৮ / ১৯ ভাদ্রশ্য ।"

এই গদ্যাংশ একটি সুদীর্ঘ বাক্য নয়। কয়েকটি বাক্যের সমষ্টি বিশেষ। পূর্ণচ্ছেদের পরিবর্তে আর' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এখনও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এটি ব্যবহার হয়। সম্বন্ধপদে 'এর' না লিখে 'র' লেখা হয়েছে—'লস্কররর'। দ্বিতীয়া চতুর্থীতে 'র' প্রয়োগ 'মণিরামরে'। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এসেছে সৌষ্ঠব : 'উজির পাতিলাম'

(উজির বা মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিলাম), শব্দ নির্বাচনে ও সন্নিবেশে পটুতা, দূরান্বয় বর্জন, পদান্বয়ে সৌষ্ঠব যে কতটা অর্জিত হয়েছিল তা এথেকে বোঝা যায়।

শ্রীহট্টে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি রসিদ পাই। এর ভাষাগত একটি গুরুত্ব আছে। কারণ এটির ভাষার সঙ্গে পূর্বোক্ত ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের "শ্রীযুত মিত্রি গাই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু'র সঙ্গে কৃত চুক্তির ভাষার সাদৃশ্য আছে। অপরপক্ষে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এরও পরে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর ব্যাকরণে বাংলা ভাষার উদাহরণ হিসাবে জগতিধর রায়ের নামে যে চিঠি ছেপেছেন সেটি যে তৎকালীন বাংলা গদ্যের প্রকৃত উদাহরণ নয় তা বলা যায়। রসিদটি এইরকম ঃ-

"লিখিতং শ্রী চৌধুরী ও কানুনগোবর্গ পরগণে লঙ্গলা মহলে খালিসা কস্য কবজ পত্রমিদং কার্জ্যঞ্চ আগে আমরা পরগণে ইটাত ৺জিউর দিঘিতে মাটী কামলা বেগার দিছিলাম – এবার অজুরা সত্ত্ব দিঘি মজবুর যে মাটী কাটিছিলা এর মবলগ ১৪৮।/১০। একসত আটচল্লিস কাহন নও পণ সাড়ে দশ গণ্ডা কৌড়ী মাহাফিজ তপছিল জএল মবলগ মজকুর গৌরিবল্লভ ও গরবহর তহবিল হলে তামাম কামাল সমঝিআ পাইলাম পাইয়া কবজ দিলাম হাসিব হবে দাওয়া করি কুটা বাতিল এতদার্থ কবজপত্র দিলাম ইতি সব ১১৫৬ সাল ৪ তারিখ সাবান—।"

আর একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যে লিখিত দলিল হল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক স্বহস্ত সাক্ষরিত ইতিহাসখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের উদ্দেশ্যে প্রণীত। এর ভাষাগত গুরুত্ব বেশী নেই। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্তমান।

বাংলা গদ্য ভাষা যে কতদূর ভারবহ সমর্থ, গুরুচিন্তা প্রকাশক্ষম তার প্রমাণ পাই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃত কোচবিহারের রাজা ধৈর্যনারায়ণের পক্ষে ধরেন্দ্রনারায়ণ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সম্পাদিত এক

সন্ধিপত্রে। মূল সন্ধির ভাষা যে কি ছিল তা প্রকাশ পায় নি। তবে ভাষার গঠন দেখে মনে হয় এটি তৎকালীন রাজভাষা ফারসি অথবা ইংরেজিতে লিখিত। পরে বাংলায় অনুদিত হয়। সে যাই হোক এর বাংলা ভাষা খুবই শ্লাঘার বিষয়। এই সন্ধিপত্রে ইংরেজদের পক্ষে ওরিন হিষ্টিন, ওলিস অনডরসি ও রিচার্ড বারওএল এর নাম আছে। এতে এমন কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বাংলা ভাষার ঐ প্রাথমিক স্তরে Signed sealed and Constituted অর্থে দস্তখত করিলেন মোহর করিলেন এবং সমাধা করিলেন ব্যবহার করা হয়েছে। এর ভাষার সামান্য উদাহরণ এখানে উল্লেখিত হল।

"১ দফা—

রাজা দিবেন পঞ্চদশ হাজার টাকা রঙ্গপুরের তহসীলদারকে ফৌজের খরচ জে ফৌজ গীয়াছে তাহার হেফাজিত কারণ

২ দফা—

যদি পঞ্চদশ হাজার টাকা হইতে জ্যাদা খরচ হয় তবে সে টাকা রাজা দিবেন কুম্পানিতে যদি পঞ্চদশ হাজার অন্দরে ফৌজের খরচ দিয়া জে কিছু উদ্বর্ত্ত হয় তাহা রাজা ফিরিয়া পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি,

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই সময়ে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল। একদিকে ইংরেজ রাজত্ব দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হ'ল। ইংরেজরা এদেশীয় আচার আচরণ, দর্শন-বিজ্ঞান, আইনকানুন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। ভারতীয় আইনের সংকলন জেন্টুকোড ইংরেজিতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল। বাংলা তথা ভারতীয় স্মৃতি-পুরাণ-কাব্যগ্রন্থের এটিই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ। এতে প্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মোরাভিয়ান ব্রীদ্রেন শ্রীরামপুরে এলেন। এরা বাংলা শিখে একখানি অভিধান সংকলন করলেন ও অনেক বই

অনুবাদ করলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেসটিংস এর অনুরোধে হালহেডের লেখা বাংলা ব্যাকরণের উদাহরণগুলি ছাপার জন্য হুগলী কুঠির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স সঞ্চালনযোগ্য বাংলা ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করলেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়।

শুধু স্মৃতিধাষ্টতার উপর নির্ভর করে বাংলা সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত প্রথাগুলির মাত্র অনুবর্তন করতে পেরেছিল। পুস্তকের রচয়িতা পুস্তক রচনার পর তা নিজ এলাকার বাইরে প্রচারের সুযোগ পেতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকরদের দ্বারা কয়েকটিমাত্র কপি করানো হত। এইসব লিপিকরদের সুন্দর হস্তাক্ষরই একমাত্র যোগ্যতা ছিল। বানান ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের কোনরকম শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল না। এইরকম এক অবস্থার মধ্যে বাংলা সাহিত্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ছাপার অক্ষরের প্রচলনে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি যেন হঠাৎ এক ধাক্কায় নতুনভাবে তীব্রবেগে এগিয়ে গেল।

আগে যে সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ পুঁথি প্রস্তুত হত বাংলা অক্ষরে ছাপা শুরু হওয়ার পর তাও বন্ধ হয়ে গেল। এরই মধ্যে আমরা সন ১০৯৬ সাল' ও 'সন ১০৯৭"র দুখানি আদালতে পেশ করার আরজির সন্ধান পাই। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ইতিমধ্যে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকানের সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আইনের ধারাওয়ারী অনুবাদ 'দেওয়ানী আদালতের বিচার পরিচালনের নিয়মাবলী' প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ছাপার অক্ষরে এই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

আদালতে পেশ করা আরজি দুটি ছোট তুলট কাগজে লেখা। প্রাপ্তিস্থান বাঁকুড়া জেলায়। তাই এদুটির সন বাংলা না হয়ে মল্লাব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। সে হিসাবে ইংরেজী তারিখ হবে যথাক্রমে ১৭৯০ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ। একটি দেওয়ানি আদালতের ও অন্যটি ফৌজদারি আদালতের 'সীযুৎ সাহেব বরাবরেষু' লিখিত। দেওয়ানি আদালতে

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্য পুঁথি হল কাছাড়ের রাজা কীর্তি চন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রণীত দুখানি সনদ। এর ভাষাগত উদাহরণের কারণে একটি উল্লেখ করা হল :—

" শ্রী গম ।

৺ স্বস্তি : প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড ভব প্রতাপ দাবানল শলভিকৃত বৈরী নিকর শরদিন্দু সন্দর জন হেড়ম্বপুর পুরিত পুরন্দর শ্রী শ্রীযুক্ত কীর্তি-চন্দ্র নারায়ণ মহারাজা মহমহগ্র প্রচণ্ড প্রতাপেষু—

অভয় পত্র লিখনং

মিদং কার্জাঞ্চ –

আর বড়গলার চান্দগা লস্করর বেটা মণিরামরে আমি জানিয়া কাচারির নিআমে উজির পাতিলাম এতে অখন অবধি তুমার উজিরর বেটা ও নাতি ও পরিনাতি তার ধারা সূত্রক্রমে এই উজির হৈআ জাইব আর মজুন্দারের বেটা মজুন্দার হৈব আর বড় ভুইআর বেটা বড় ভুইআ হৈব এতধর্থে অভয় দিলাম এতে কাল কাদাল কুনদিন এই বাক্য দড় কুন জনে না ভাড়িব আর চতুরাসিমা পর্ব্বে বল্লা হাহর ও আভঙ্গ পশ্চিমে তাহিরর পচ্ছিমর সিমা এই তাহিবরে বড়গলার জাবরে দিলাম এতে কুন শন্দেহ না আছে আর রাজ্যর মনুশ্য জে জনে উজিবর বাক্যে না চলে মেল দেযান হেলা করিআ (আকুষ্ট) সর্বদণ্ড করিমু এতদর্থে অভয়পত্র দিলাম ইতি শক ১৬৫৮ / ১৯ ভাদ্রশ্য ।"

এই গদ্যাংশ একটি সুদীর্ঘ বাক্য নয়। কয়েকটি বাক্যের সমষ্টি বিশেষ। পূর্ণচ্ছেদের পরিবর্তে আর' শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়। এখনও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে এটি ব্যবহার হয়। সম্বন্ধপদে 'এর' না লিখে 'র' লেখা হয়েছে—'লস্করর'। দ্বিতীয়া চতুর্থীতে 'র' প্রয়োগ 'মণিরামরে'। ক্রিয়াপদের ব্যবহারে এসেছে সৌষ্ঠব : 'উজির পাতিলাম'

(উজির বা মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিলাম), শব্দ নির্বাচনে ও সন্নিবেশে পটুতা, দূরান্বয় বর্জন, পদান্বয়ে সৌষ্ঠব যে কতটা অর্জিত হয়েছিল তা এথেকে বোঝা যায়।

শ্রীহট্টে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি রসিদ পাই। এর ভাষাগত একটি গুরুত্ব আছে। কারণ এটির ভাষার সঙ্গে পূর্বোক্ত ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের "শ্রীযুত মিত্রি গাই সাহেব মিত্রি গারবেল মহাসহেষু'র সঙ্গে কৃত চুক্তির ভাষার সাদৃশ্য আছে। অপরপক্ষে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড এরও পরে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর ব্যাকরণে বাংলা ভাষার উদাহরণ হিসাবে জগতিধর রায়ের নামে যে চিঠি ছেপেছেন সেটি যে তৎকালীন বাংলা গদ্যের প্রকৃত উদাহরণ নয় তা বলা যায়। রসিদটি এইরকম ঃ—

"লিখিতং শ্রী চৌধুরী ও কানুনগোবর্গ পরগণে লঙ্গলা মহলে খালিসা কস্য কবজ পত্রমিদং কার্জ্যঞ্চ আগে আমরা পরগণে ইটাত ৺জিউর দিঘিতে মাটী কামলা বেগার দিছিলাম – এবার অজুরা সত্ত্ব দিঘি মজবুর যে মাটী কাটিছিলা এর মবলগ ১৪৮।/১০। একসত আটচল্লিস কাহন নও পণ সাড়ে দশ গণ্ডা কৌড়ী মাহাফিজ তপছিল জএল মবলগ মজকুর গৌরিবল্লভ ও গরবহর তহবিল হলে তামাম কামাল সমঝিআ পাইলাম পাইয়া কবজ দিলাম হাসিব হবে দাওয়া করি কুটা বাতিল এতদার্থ কবজপত্র দিলাম ইতি সব ১১৫৬ সাল ৪ তারিখ সাবান—।"

আর একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা গদ্যে লিখিত দলিল হল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে নাটোরের রাণী ভবানী কর্তৃক স্বহস্ত সাক্ষরিত ইতিহাসখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের উদ্দেশ্যে প্রণীত। এর ভাষাগত গুরুত্ব বেশী নেই। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্তমান।

বাংলা গদ্য ভাষা যে কতদূর ভারবহ সমর্থ, গুরুচিন্তা প্রকাশক্ষম তার প্রমাণ পাই ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কৃত কোচবিহারের রাজা ধৈর্যনারায়নের পক্ষে ধরেন্দ্রনারায়ণ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে সম্পাদিত এক

সন্ধিপত্রে। মূল সন্ধির ভাষা যে কি ছিল তা প্রকাশ পায় নি। তবে ভাষার গঠন দেখে মনে হয় এটি তৎকালীন রাজভাষা ফারসি অথবা ইংরেজিতে লিখিত। পরে বাংলায় অনুদিত হয়। সে যাই হোক এর বাংলা ভাষা খুবই শ্লাঘার বিষয়। এই সন্ধিপত্রে ইংরেজদের পক্ষে ওরিন হিষ্টিন, ওলিস অনডরসি ও রিচার্ড বারওএল এর নাম আছে। এতে এমন কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে যা এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বাংলা ভাষার ঐ প্রাথমিক স্তরে Signed sealed and Constituted অর্থে দস্তখত করিলেন মোহর করিলেন এবং সমাধা করিলেন ব্যবহার করা হয়েছে। এর ভাষার সামান্য উদাহরণ এখানে উল্লেখিত হল।

"১ দফা—

রাজা দিবেন পঞ্চদশ হাজার টাকা রঙ্গপুরের তহসীলদারকে ফৌজের খরচ জে ফৌজ গীয়াছে তাহার হেফাজিত কারণ

২ দফা—

যদি পঞ্চদশ হাজার টাকা হইতে জ্যাদা খরচ হয় তবে সে টাকা রাজা দিবেন কুম্পানিতে যদি পঞ্চদশ হাজার অন্দরে ফৌজের খরচ দিয়া জে কিছু উদ্বর্ত্ত হয় তাহা রাজা ফিরিয়া পাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি,

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে এই সময়ে কয়েকটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গেল। একদিকে ইংরেজ রাজত্ব দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হ'ল। ইংরেজরা এদেশীয় আচার আচরণ, দর্শন-বিজ্ঞান, আইনকানুন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। ভারতীয় আইনের সংকলন জেণ্টুকোড ইংরেজিতে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল। বাংলা তথা ভারতীয় স্মৃতি-পুরাণ-কাব্যগ্রন্থের এটিই প্রথম ইংরেজী অনুবাদ। এতে প্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মোরাভিয়ান ব্রীদ্রেন শ্রীরামপুরে এলেন। এরা বাংলা শিখে একখানি অভিধান সংকলন করলেন ও অনেক বই

অনুবাদ করলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেসটিংস এর অনুরোধে হালহেডের লেখা বাংলা ব্যাকরণের উদাহরণগুলি ছাপার জন্য হুগলী কুঠির সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চার্লস উইলকিন্স সঞ্চালনযোগ্য বাংলা ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করলেন পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায়।

শুধু স্মৃতিধাষ্টতার উপর নির্ভর করে বাংলা সাহিত্য দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত প্রথাগুলির মাত্র অনুবর্তন করতে পেরেছিল। পুস্তকের রচয়িতা পুস্তক রচনার পর তা নিজ এলাকার বাইরে প্রচারের সুযোগ পেতেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে লিপিকরদের দ্বারা কয়েকটিমাত্র কপি করানো হত। এইসব লিপিকরদের সুন্দর হস্তাক্ষরই একমাত্র যোগ্যতা ছিল। বানান ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের কোনরকম শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছিল না। এইরকম এক অবস্থার মধ্যে বাংলা সাহিত্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ছাপার অক্ষরের প্রচলনে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি যেন হঠাৎ এক ধক্কায় নতুনভাবে তীব্রবেগে এগিয়ে গেল।

আগে যে সীমিত সংখ্যক গ্রন্থ পুঁথি প্রস্তুত হত বাংলা অক্ষরে ছাপা শুরু হওয়ার পর তাও বন্ধ হয়ে গেল। এরই মধ্যে আমরা 'সন ১০৯৬ সাল' ও 'সন ১০৯৭"র দুখানি আদালতে পেশ করার আরজির সন্ধান পাই। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন ইতিমধ্যে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জোনাথান ডানকানের সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আইনের ধারাওয়ারী অনুবাদ 'দেওয়ানী আদালতের বিচার পরিচালনের নিয়মাবলী' প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ছাপার অক্ষরে এই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

আদালতে পেশ করা আরজি দুটি ছোট তুলট কাগজে লেখা। প্রাপ্তিস্থান বাঁকুড়া জেলায়। তাই এদুটির সন বাংলা না হয়ে মল্লাব্দ হওয়াই স্বাভাবিক। সে হিসাবে ইংরেজী তারিখ হবে যথাক্রমে ১৭৯০ ও ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ। একটি দেওয়ানি আদালতের ও অন্যটি ফৌজদারি আদালতের 'সীযুৎ সাহেব বরাবরেষু' লিখিত। দেওয়ানি আদালতে

ফরস্টারের অনুবাদ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের। এথেকে একটি জিনিস পরিস্কার যে ফরস্টারের যে অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তা অন্ততঃ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের কোন আইনের নয়, ১৭৯১ বা তার আগের কোন আইনের। তা না হলে এড্‌মনস্টোন ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ঐটি অনুবাদ করতে পারতেন না। তাই আলোচ্য পুঁথিটির কোন অংশই ফরস্টারের এই উদ্ধৃত অনুবাদটি নয়। ফরস্টারের ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের অনূদিত আইন সংগ্রহ প্রয়োজন। তা না হলে সমস্যাটি যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যাবে। অর্থাৎ এই পুঁথিটির অনুবাদক কে তা নির্ণয় করা সহজ হবে না। কারণ উদ্ধৃতি দুটির অনুবাদ থেকে বোঝা যায় ঐগুলি Regulations for the guidance of the Magistrates-এর বঙ্গানুবাদ।

বাংলা গদ্য পুঁথির আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের সুরেন্দ্র নাথ সেন প্রণীত 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সংকলন'-এ কোচবিহার রাণীদের লেখা চিঠিগুলির উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়। বিশেষভাবে রাণী মরিচমতীর চিঠির ভাষা এতই সংবেদনশীল যে তা' রাজনীতির উর্দ্ধে হৃদয়কে স্পর্শ করে। এই ভাষা তৎকালীন অন্যান্য প্রচলিত পুঁথি-পুস্তকের ভাষা অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের।

বাংলা গদ্য পুঁথির সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনা করলে আমরা কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করি। প্রথমতঃ এই পুঁথিগুলির সবগুলিই প্রায় আইন ও শাসন শৃংখলা সম্পর্কিত। অপরপক্ষে পদ্য পুঁথিগুলি প্রায়শঃই ধর্মাশ্রিত। দ্বিতীয়তঃ বাংলা গদ্যভাষা যে কতটা ভারবহন সমর্থ ও প্রকাশক্ষম তা এই পুঁথিগুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। আইনের ন্যায় টেকনিক্যাল বিষয়বস্তু প্রকাশেও কোনরকম অসুবিধা হয়নি। তৃতীয়তঃ বাংলা গদ্যের সেই প্রাথমিক স্তরেও ভাষার গঠন প্রণালী অত্যন্ত সুসংবদ্ধ ছিল—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রের ভাষা প্রায় আধুনিক কালের ন্যায়। সে তুলনায় পরবর্তীকালের সাহিত্যের প্রাথমিক স্তরের ভাষা অনেক অসংবদ্ধ ছিল। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের উল্লিখিত চুক্তি ও রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রের

ভাষার (১৮০১) তুলনা করতে পারি। চতুর্থত এইসব পুঁথিতে বাংলা দেশের ইতিহাস, সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানতে পারি। এ ব্যাপারে কোচবিহার রাজার সন্ধি রাণী ভবানীর দলিল ও আদালতের আরজিগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চমতঃ এইসব পুঁথিগুলি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হওয়ায় ভাষার মধ্যে নানা প্রত্যন্তের উপভাষার তৎ-কালীন নির্দেশ পাওয়া যায়। যেমন – কাছাড়ের রাজার অভয়পত্র। এতে 'মণিরামমে', 'ছাত্তাল', প্রভৃতি শব্দ পাই। ষষ্ঠতঃ এমন অনেক পরিভাষা পাই যা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রাজনৈতিক ও আইনী ফারসী ইত্যাদি শব্দ ভিন্ন অনেক ইংরেজী শব্দের পরিভাষা পাই। উদাহরণ হিসাবে কোচবিহারের সন্ধি ও ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের আইনের কথা বলতে পারি।

বাংলা গদ্যপুঁথি সম্পর্কে গবেষণা এখনও আরও বাকী আছে। এর পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ও আলোচনা করলে আমাদের ভাষা, ইতিহাস, সমাজ তথা অর্থনীতির আরও নতুন তথ্য জানা যাবে– গবেষণার দিগন্তও প্রসারিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

—০—

একটি দুষ্প্রাপ্য গদ্য পুঁথি ঃ বেদান্তসার

অধ্যাপক গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য্য

ছন্দ ও সুরের সংগে বাংলার মানুষের প্রাণের যোগ বহুদিনের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তাই ছন্দোবদ্ধ পুঁথিতেই বেশী পাওয়া যায়। এ যুগের বাংলা গদ্যের নিদর্শন দেখা যায় খুবই কম। বোধ হয় সেই জন্যেই অনেকের ধারণা বাংলা গদ্যের জন্ম হয়েছে উনিশ শতকে। কিন্তু এই ধারণা কতটা সঠিক, তার পর্যালোচনা বিশেষ হয়েছে বলে মনে হয় না। বাংলা পুঁথির মধ্যে গদ্যের অনুসন্ধান করা এখনও দরকার।

আঠারো উনিশ শতকের সন্ধিক্ষণে রচিত বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসার সুদীর্ঘ কালধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে শ্রীরামপুর কলেজের কেরীগ্রন্থাগারে। বহু মনীষী, গবেষক ও সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থাগার হতে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউই এই গদ্য পুঁথিটীকে লক্ষ্য করেন নি। সম্প্রতি আকস্মিক ভাবেই নজরে পড়ে যায় পুঁথিটি। গ্রন্থাগারের প্রাথমিক তালিকায় পুঁথিটি সংস্কৃত পুঁথির সংগে থাকায় গ্রন্থাগারও এর অবস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। বাংলা পুঁথির পৃথক তালিকা প্রণয়নের সময়েই পুঁথিটির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

কেরী লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহের নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। এখানকার পুঁথির বেশীর ভাগই পুস্তকাকারে অনুলিখিত। এই অনুলিখন ১৮১৮-১৯ এর আগেই হয়েছে কারণ শ্রীরামপুর কলেজের ১৮১৮-১৯ এর বিবরণীতে পুস্তকাদির যে তালিকা আছে তাতে এই পুঁথিগুলির নাম পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি দেখা যায় ঃ— ১। বেশীর ভাগ পুঁথি মৌলিক নয়, অনুলিখিত

২। বেশীর ভাগই পুস্তকাকার, পুঁথির আকার নয় ৩। বিভিন্ন ভাষার পুঁথি থাকলেও সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথির সংখ্যাই বেশী। ৪। সংস্কৃত পুঁথি বাংলা অক্ষরে লিখিত। ৫। পদ্য ও গদ্য উভয় ধারায় লিখিত পুঁথি আছে ৬। বিষয়ের মধ্যে প্রধান হল ধর্মদর্শন ও ভাষা শিক্ষা। অনুমান করা যায় হয়তো অনেক বেশী পুঁথি সংগৃহীত হয়েছিল। উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে অল্প সংখ্যকই টিকে আছে।

বেদান্তসার পুঁথিটিতে লেখা আছে ১৮০৩ সালে রচিত হইল। কিন্তু শ্রীরামপুরে সে সময় যে গদ্য চালু হয় তার সংগে এর ভাষার কোন মিল নেই। এর রচনার স্বাভাবিক সাবলীলতা দেখে বিনা দ্বিধায় মনে করা যেতে পারে গদ্যরীতি তখন এদেশে সুপ্রচলিত ছিল এবং এ পুঁথিটি কোন বিরল উৎপাদন নয়। এদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও বেদান্ত চর্চার অভাব ছিল না তা বোঝারও কোন অসুবিধা হয় না।

পুঁথিটি মূল বাংলা তর্জমার অনুলিপি হতে পারে মিশনের প্রয়োজনে প্রস্তুত হয়েছিল। মিশনের প্রয়োজন দুটি কারণে হতে পারে। প্রথম কেরী হিন্দু সমাজের নৃশংস প্রথা দূরীকরনের প্রয়াসী ছিলেন, তিনি হিন্দু শাস্ত্রাদি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে জানবার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্র পুরানাদির পুঁথি নকল করান। দ্বিতীয় ওয়ার্ড হিন্দু ধর্ম সমাজ, ইতিহাস, রীতিনীতি সম্পর্কে একটি সুবৃহত গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাঁর ও প্রয়োজন হয় বিভিন্ন পুঁথির অনুলিখন। এদের দুজনের উদ্যোগেই শ্রীরামপুরের পণ্ডিতদের দ্বারা বাংলা ও সংস্কৃত পুঁথি অনুলিখিত হয়। 'বেদান্তসার' হয়তো ওয়ার্ডের প্রয়োজনেই সংগৃহীত হয়েছিল কারণ এর প্রায় ইংরেজী অনুবাদ ওয়ার্ডের ১৮১১ সালে প্রকাশিত Account of the writings religion and manners of the hindoos বইএতে দেখা যায়। বৈষ্ণব প্রধান শ্রীরামপুর অঞ্চলে সে সময় বেদান্ত চর্চার কোন কেন্দ্র ছিল বলে মনে

হয় না। পুঁথিটির সংস্কৃত ভাষ্য (কেরী গ্রন্থাগার রক্ষিত) কোনো বেদান্ত চর্চার কেন্দ্র হতে সংগৃহীত এবং শ্রীরামপুরের কোন বৈদান্তিত পণ্ডিত কর্তৃক অনুদিত।

লিপির ছাঁদ ও লেখার ধরণ দেখে অনায়াসেই মনে করা যায় রচনাটি আঠারোশতকের শেষের দিকের গদ্যের ধারা অনুযায়ী লিখিত। এ সময় গদ্য রচনার প্রবনতা অনেকটা বেড়ে গেছে কোম্পানীর বিধি নির্দ্দেশ বাংলা গদ্যে প্রচারিত হওয়ার জন্য। বিস্তৃত আলোচনা করলে হয়তো দেখা যেতে পারে ১৮০৩ সালে অনুলিখিত হলেও বেদান্তসারের বাংলা অনুবাদ আরও আগেই হয়েছে।

বেদান্তসারের প্রাথমিক পরিচয় নিম্নেপ্রদত্ত হল :—

নাম : বেদান্তসার রচয়িতা : স্বামী অদ্বয়ানন্দের শিষ্য
(অনুমান : সদানন্দযোগীন্দ্র)

অনুবাদ বা অনুলিখনের সময় : খৃঃ ১৮০৩ সাল অনুবাদক অজ্ঞাত

আকার ২১ সে : × ৩৫ সে : পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১

প্রতি পৃষ্ঠায় লাইন সংখ্যা (গড়) ২৪ মোট শব্দ সংখ্যা ৮৬৫০

কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লিখিত হস্তাক্ষর দুইজনের

কাগজ : ঈষৎ লালচে, মোটা, হাতে তৈরী কাগজ। শ্রীরামপুরে কাগজ তৈরী তখনও সুরু হয় নি। পণ্ডিতের দ্বারা সংগৃহীত দেশীয় কাগজ বলে অনুমান করা যায়।

কালী : বাদামী কালচে রংএর কালী। দেশীয় কালী বলে মনে হয়। পুঁথিটির বর্তমান অবস্থা মোটামুটি ভালো হলেও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

ভারতীয় শাস্ত্রাদিতে বেদ সবচেয়ে প্রাচীন। এরপর রচিত হয় ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য তার উপসংহারে আছে আরণ্যক। আরণ্যকের পর উপনিষদ। এখানেই বলা হয় বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ। সেজন্য এদের পরিচয় বেদান্ত। বৈদান্তিক সত্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক

টীকাকার, ভাষ্যকারের আবির্ভাব হয়েছে বিভিন্ন যুগে। বেদান্তের প্রতি আগ্রহ সর্বকালেই সমভাবে দেখাযায় কারণ বেদান্ত সর্বরকম সংকীর্ণতা হতে মুক্ত। বেদান্ত ইহজীবনেই পরম সত্যের জ্ঞান অনুসন্ধান করে এবং সেজন্য জোর দেয় নৈতিক শৃঙ্খলার ওপর। সকলের কাছেই বেদান্তের আবেদন সাড়া জাগাতে পারে।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ বেদান্ত-সার। শ্রীশঙ্করাচার্য এর সাহায্যে শিক্ষা দেন এবং তাঁর শীষ্যরা সেই শিক্ষাকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেন। বিভিন্ন ভাষ্যকার এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বেদান্তসারের জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলেন। এই ব্যাখ্যা গুলির মধ্যে সুবোধিনী, বালাবোধিনী ও বিদ্যামনোরঞ্জিনী বিশেষভাবে পরিচিত। শ্রীশঙ্করাচার্যের অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী। তিনি স্বামী অদ্বয়ানন্দের শিষ্য এবং তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ। সুবোধিনী ভাষ্যকার নৃশিংহ সরস্বতী কৃষ্ণানন্দের অনুগামী ছিলেন। সুবোধিনী ১৬ শতকের শেষের দিকে প্রচারিত এবং সেই হিসাবে মনে হয় সদানন্দ ১৫ শতকের মধ্যভাগে বেদান্তসারের ভাষ্য রচনা করেন। পরবর্তি তিন শতকে এই ভাষ্য বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। আলোচ্য পুঁথিটি সদানন্দের ভাষ্যের অনুবাদ। কখন ঠিক বাংলায় প্রথম অনুদিত হয় তা জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে উনিশ শতকের আগেই অনুবাদ সুরু হয়ে যায়। আলোচ্য পুঁথিটিতে আছে স্বামী অদ্বয়ানন্দের কোন এক শিষ্য কর্তৃক ১৮০৩ সালে অনুদিত।

অনুবাদটি সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, বরং অনুশরণে লিখিত বলা যায়। অনুবাদক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তত্ত্ব ও ভাষা উভয়ের ওপরই তাঁর গভীর জ্ঞান থাকায় জটীল দার্শনিকতত্ত্বকে যিনি উদাহরণের সাহায্যে অল্প জ্ঞান বিশিষ্ট সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে লিখতে পেরেছেন। এদিক দিয়ে পরবর্তি কালের অনেক রচনার চেয়ে এই অনুবাদকের রচনা অনেক উৎকৃষ্ট। উদাহরণ বা দৃষ্টান্তগুলি অনুবাদ-কের নিজের বলে মনে হয়। তিনি সচেতন ছিলেন যে ধর্ম কথা

সাধারণ মানুষ ছন্দে শুনতে অভ্যস্ত, তাদের কাছে তত্বকথা গদ্যে শোনাতে হলে উদাহরণের প্রাচুর্য অপরিহার্য।

পুঁথিটির ভাষার সংগে ২০/৩০ বছরের পরের ভাষার বেশমিল দেখা যায়। সমসাময়িক কালের রচনায় এরূপ ভাষার নিদর্শন অপ্রতুল হলেও বিশ্বাস করা কঠিন যে এরূপ রচনা সে সময়ে একটি মাত্র রচিত হয়েছিল যা জটিল দার্শনিক তত্বকে সহজ ও সাবলীল ভাবে প্রকাশ করেছে, যেমন ঃ—

বেদান্তসার (১৮০৩)

১। "শীত, উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, লাভহানি, জয় পরাজয় ইত্যাদি সকলের নাম দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বেতে যে সমভাব তাহাকে তিতিক্ষা বলি।" (পৃঃ ৫)

২। "জগতের কর্ত্তা ব্রহ্ম তিনি চেতন নিত্য এক। তাহার কার্য্য জগত অচেতন অনেক অনিত্য। লোকেতে যত কর্ত্তা তাহারা সকলেই চেতন অচেতন কখন কর্ত্তা হইতে পারে না। যে সকল কার্য্য সে সকলেই অচেতন চেতন কার্য্য কখন হইতে পারে না। এই লৌকিক দৃষ্টান্ত। এবং বেদপ্রমানেতে ব্রহ্মাচেতন।" (পৃঃ ৬)

৩। "...পরম কারুনিক শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জুনের দুর্য্যোধনাদির সহিত যুদ্ধকালে আমার ইহারা আত্মীয় আমি এই ভীষ্মাদিকে মারিলে ইহার পাপ ভোগ করিব ইত্যাদি নানা প্রকার অন্যায় অজ্ঞান মূলক অহঙ্কার এবং মমকার তাহার নিবৃত্তির নিমিত্তে ঐ অর্জ্জুনকে সর্ব্ববেদের সারার্থ রূপ ঐ অধ্যাত্ম বিদ্যা বেদব্যাস নামা মহামুনি সূত্রে বদ্ধ করিলেন সেই সূত্র সকলের পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভাষ্যরূপ সমুদ্র করিয়াছেন তাহাকে মন্থন করিয়া অতি সংক্ষেপে সমুদায় সারার্থরূপ অমৃত উদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত অদ্বয়ানন্দ পরমহংস সন্ন্যাসির শিষ্য কেহো বেদান্তসার নামে যে গ্রন্থ করিয়াছেন ঐ গ্রন্থের অর্থসকল গৌড়দেশীয় ভাষাতে শ্রীলশ্রীঅমুক নামা বড় সাহেবের অধিকার সময়ে আঠারো শত তিন সালে রচিত হইল।" (পৃঃ ১)

৪। "তাহার বিবরণ দুই পুরুষ দুই রথে আরোহণ করিয়া কোন দেশে যাইতেছিল পথমধ্যে এক পুরুষের রথ পুড়িয়া গেল অশ্ব থাকিল দ্বিতীয় পুরুষের অশ্ব নষ্ট হইল রথ থাকিল। সেই দুই পুরুষ যুক্তি করিয়া এক পুরুষের অশ্বকে অন্যের রথেতে যোজনা করিয়া অনায়াসে প্রাপ্তব্য দেশকে পাইল।" (পৃঃ ৫)

পরবর্তি কালে বাংলায় বহু বেদান্ত গ্রন্থ ও বেদান্তসার রচিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বে বেদান্তের শিক্ষা সুপ্রসারিত হয়েছে। কিন্তু জানা যায়নি, এই পুঁথিটির অনুসরনে কোন গ্রন্থ রচিত বা প্রকাশিত হয়েছে কিনা কিংবা পরবর্তি কালের বেদান্ত চর্চার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা।

এই বেদান্তসারের ভাষার বিস্তৃত পর্যালোচনা করলে বাংলা গদ্যের উদ্ভব সম্পর্কে নতুন আলোক পাত করা সম্ভব হবে। তাছাড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান হিসাবেও পুঁথিটির বিশেষ গুরুত্ব আছে।

অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও শিক্ষানুরাগীদের সুবিধার্থে খুব শীঘ্রই পুঁথিটির মুদ্রিত রূপ প্রকাশিত হবে

— o —

একটি অজ্ঞাত বাংলা গদ্য পুঁথি

সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার

শ্রীপ্রণব কুমার দেব

সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার অদ্বৈত বেদান্তের একটি শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ। বিগত ৫০০ বছর ধরে এই ক্ষীণকায় গ্রন্থটি বেদান্ত দর্শনের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, বহু পঠিত ও বহু আলোচিত। এই গ্রন্থটির এমন কিছু বৈশিষ্ট আছে যা অন্য কোন প্রকরণ গ্রন্থে নেই। সেইজন্যই এর এত জনপ্রিয়তা।

শঙ্করাচার্য অদ্বৈত মতবাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা। এই মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বহু গ্রন্থ, টীকা ও ভাষ্য রচনা করেছিলেন। পরে তাঁর শিষ্যেরাও এই মতবাদ প্রচারের জন্য অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এর অধিকাংশই শঙ্কর মতবাদের ব্যাখ্যা, অনেকগুলি মৌলিক গ্রন্থও আছে। সদানন্দের কালে এসে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন টীকা, তস্য টীকা ও ভাষ্যে অতি ভারাক্রান্ত ও দুরধিগম্য হয়ে পড়ে। অদ্বৈত বেদান্তের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে ও সহজে বলার প্রয়োজনীয়তা সদানন্দ তাই উপলব্ধি করেন। বেদান্ত দর্শনে সদানন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। স্বীয় যুক্তি ও প্রতিভার আলোকে বিশাল অদ্বৈত বেদান্তকে যেমন হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তা তিনি যতদূর সম্ভব সরলভাবেই তাঁর বেদান্তসারে পরিবেশন করেন। মিতভাষিতা ও সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই চর্বিতচর্বনের কালে সদানন্দের বেদান্তসার মৌলিকতার দাবী রাখে এবং সেইজন্যেই গ্রন্থটি সুদীর্ঘকাল ধরে ছাত্র ও পণ্ডিত সমাজে সমাদর পেয়ে আসছে।

সদানন্দের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নানা অভিমত আছে।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সদানন্দ সম্ভবতঃ পনের শতকের মধ্যভাগ হতে ষোল শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কোন এক সময়ে আবির্ভূত হন। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নৃসিংহ সরস্বতী বেদান্তসারের 'সুবোধিনী' টীকা রচনা করেন। রামতীর্থ স্বামী রচনা করেন 'বিদ্বন্মনোরঞ্জনী' টীকা এবং সতের শতকে আপোদেব 'বালবোধিনী' টীকা রচনা করেন।

উনিশ ও বিশ শতকে সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার গ্রন্থটির ওপর অনেকগুলি ভাল বই প্রকাশিত হয়েছে, ইংরেজী ও বাংলায় আলোচনাও হয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজীতে Ward, Ballentine, Jacob, Duttasastri, Deussen Paul, Hiriyana, Nikhilananda প্রভৃতি এবং বাংলা ভাষায় আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, সহদেব হালদার প্রমুখের বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনেকে মনে করেন আঠারো শতকে বাংলায় ন্যায় ও দর্শনের চর্চা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই অন্ধকার যুগেও বেদান্ত চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত পুঁথিপত্রে আজও তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। গবেষকদের কাছে এগুলি খুব মূল্যবান। সম্প্রতি কেরী লাইব্রেরীতে সংস্কৃত পুঁথির মধ্য হতে বাংলা গদ্যে লেখা বেদান্তসার পুঁথিটির অবস্থিতি জানা গেছে। বেদান্তসারের এই বাংলা অনুবাদ পুঁথিটি (বরং ভাবানুবাদ বলাই ভাল) ১৮০৩ সালে রচিত বলে উল্লেখ আছে। রচয়িতার নাম নেই। বেদান্তসারের সংস্কৃত পুঁথিও কেরী লাইব্রেরীতে আছে।

এই বাংলা পুঁথিটির আলোচনার আগে এক সল্প আলোচিত তথ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। Ward ১৮১১ খৃষ্টাব্দে Account of the writings, religion and manners of Hindoos নামে ৪ খণ্ডের একটি বই প্রকাশ করেন। বইটিতে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলী, রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতং প্রভৃতি

বইএর অনুবাদের সংগে সদানন্দের বেদান্তসারের অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এটিই সদানন্দের বেদান্তসারে প্রথম ইংরেজী অনুবাদ। এই অনুবাদে নানা ত্রুটি আছে। Ward হিন্দু দর্শনের পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে অনুবাদ করেন এবং ভূমিকায় লেখেন, "The translation of the substance of the Vedanta Saru, which he (author) has given, may afford a specimen of the contents of the Dursunus." ওয়ার্ড সংস্কৃত জানতেন না, তবে বাংলায় তাঁর ভাল দখল ছিল। তিনি সম্ভবতঃ আলোচ্য পুঁথি থেকেই বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদ করেন। সাহায্যকারী পণ্ডিতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লেখেন "For the account of the six dursunus which preceeds the translation of the contents of the Vedanta Saru I am principally indebted to the learned natives." কিন্তু learned nativesদের কোন পরিচয় তিনি দেন নি।

পুঁথির আরম্ভ হয়েছে বেদান্ত শব্দের অর্থ নিরূপণ দিয়ে। সদানন্দের ব্রহ্মবন্দনা ও গুরু বন্দনার প্রথম দুটি শ্লোক অনুদিত হয় নি। অনুবাদক মূল গ্রন্থের রচয়িতার নাম করেন নি, বলেছেন স্বামী অদ্বয়ানন্দের শিষ্য কেহো। ভূমিকায় এই অধ্যাত্ম বিদ্যার উৎপত্তি ও অনুবাদের বিষয় কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বক্তব্য হল সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগের আরম্ভকালে ব্রহ্মা প্রজাদের অধম ব্যবহার একপাদ হবে, এরূপ বিবেচনা করে সূর্যবংশের আদি বীজ পুরুষ ককুস্থ রাজাকে তাঁর মদজন্ম অহঙ্কার হতে নিবৃত্ত করার জন্য এই অধ্যাত্মবিদ্যা দান করেছিলেন। মধ্যে এই বিদ্যা লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। দুর্যোধন প্রভৃতির সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় বধের পাপভাগী হবেন এই ভেবে অর্জুন যখন মুহ্যমান হয়ে পড়েন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অজ্ঞানমূলক অহঙ্কার দূর করার জন্য পুনরায় সর্ববেদের সারার্থরূপ এই অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ দেন। বেদব্যাস সেই উপদেশ সূত্রবদ্ধ করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য দেন সূত্রগুলির

ভাষ্যরূপ। তাঁর অনুগামীদের দ্বারা সেই ভাষ্যরূপ চতুর্দিকে প্রচারিত হতে থাকে। অন্যতম অনুগামী অদ্বয়ানন্দের কোন শিষ্যের সদানন্দের) রচিত শঙ্কর ভাষ্যের সারার্থ গৌড়দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

একটি সুপ্রাচীন তর্ক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য কর্মকাণ্ডের পথ অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের পথ বেশী সুগম। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "ফলানুসন্ধান রহিত কর্ম্মসহকারে তত্ত্বজ্ঞান ঈশ্বরপ্রাপ্তির কারণ হন পূর্ববেদান্তিদের এই মত। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ভাষ্যেতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য নানাপ্রকার যুক্তি প্রমাণ দিয়া এই মতকে দুষিয়া কর্ম্মকাণ্ডের স্বরূপত ফলত উভয়থা পরিত্যাগ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এবং কর্মসহকার ব্যতিরেকে কেবল তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের কারণ এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। ইহার বিস্তার গীতাভাষ্যে আছে।" এখানে স্পষ্টতঃ অনুবাদক কিছুটা স্বাধীনতা নিয়েছেন।

বেদান্তসারের ভাষা সমসাময়িক (১৮০৩) সাধু গদ্যরীতির নিদর্শন হিসাবে অতি মূল্যবান। মৌখিক বা কথ্য ভাষা তখন কিছু চালু ছিল, কিন্তু সাধু গদ্যরীতির তেমন কোন নিদর্শন দেখতে পাই না। একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠার যে একট বিশেষ প্রচেষ্টা চলছিল তা বোঝা যায় এই বেদান্তসার হতে। এরকম বিশিষ্ট আলোচনার উপযুক্ত আদর্শ ভাষার তখন অভাব ছিল। পুঁথিটি রচনার সময় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঁচটি পাঠ্য পুস্তকই ছিল গদ্যরীতির নিদর্শন। সেগুলি— (১) রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত (১৮০১)। (২) উইলিয়াম কেরীর কথপোকথন (১৮০১)। (৩) রামরাম বসুর লিপিমালা (১৮০২)। (৪) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)। এবং (৫) গোলোক নাথ শর্মার হিতোপদেশ (১৮০২)। কেরীর বাইবেলী বাংলা বা রামরাম বসুর কথ্য ও ফার্সী মিশ্রিত ভাষার প্রতিদ্বন্দী হিসাবে সংস্কৃত রীতি প্রধান বাংলা গদ্য রচনার প্রয়াস তখন সুস্পষ্ট। এই প্রয়াসের প্রধান রূপকার ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সমাসবদ্ধ পদ সরল করতে এবং প্রচলিত কথারীতির

সংগে সংস্কৃত গদ্যরীতির সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে সাধু বাংলা গদ্যের একটা বলিষ্ঠ রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। বেদান্তসারের অনুবাদের মধ্যেও সেই প্রয়াস দেখা যায়।

এই অনুবাদটি বেদান্তসারের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। অদ্বৈত মতবাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি এবং ভারতীয় দর্শনের নানা শাখা প্রশাখার আচার্যগণের প্রতিষ্ঠিত মতবাদ সম্বন্ধে অনুবাদকের প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তা না হলে অদ্বৈতবাদের এরূপ প্রকরণ গ্রন্থ রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোতো না। পূর্বে আলোচিত বেদান্তসারের টীকাগুলি তিনি যে পাঠ করেছিলেন, সে চিহ্নও তাঁর অনুবাদের মধ্যে বর্ত্তমান। কোন কোন দার্শনিক তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি এমন দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন যা মূল গ্রন্থে নেই। যেমন পুঁথির ৫ পৃষ্ঠায় নষ্টাশ্বদগ্ধ রথের বিবরণ। এ যেন দর্শনবেত্তা কোন সুপণ্ডিত বেদান্তসার পড়ে যা বুঝেছেন তা ব্যক্ত করেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে এটিকে প্রায় মৌলিক সৃষ্টি বলা যায়। আবার কিছু কিছু তথ্যগত ও অন্যান্য ত্রুটিও দেখা যায়। পুঁথির প্রথম পাতায় কাকুৎস্থ রাজাকে সূর্য বংশের আদি বীজপুরুষ বলা হয়েছে। কোথাও কোথাও ভাষা দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। যতি চিহ্নের প্রয়োগের ত্রুটি বক্তব্য বিষয় বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। সদানন্দ যখন তার বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ দিয়েছেন তখন তিনি উৎস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অনুবাদক সে রকম নির্দিষ্ট করে অনেক স্থলেই তা বলেন নি, শুধু বলেছেন, 'ইহার প্রমাণ আছে।' দূরান্বয় ও অন্বয় ঘটিত ত্রুটি বিচ্যুতিও পুঁথিটিতে লক্ষ্য করা যায়. বিশেষতঃ পুঁথির প্রথম দিকে। কোথাও কোথাও পুঁথির ভাষা অতি সরল। শুধু প্রয়োজনীয় যতি চিহ্ন বসিয়ে, খটোমটো বানান ঠিক করে নিলেই আধুনিক গদ্যভাষার সংগে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। যেমন, একটি উদাহরণ.

'যে হেতুক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালে ও সর্ব্ব দেশে ও আকাশাদি সর্ব্ব পদার্থে যে থাকে বস্তু শব্দের অর্থ সেই তাহা ব্রহ্ম

ব্যতিরেকে অন্য কেহো হইতে পারে না ব্রহ্ম শব্দের অর্থ নিরবধিক মহত্ব বিশিষ্ট যিনি তিনি অতএব বস্তু ও ব্রহ্ম এই দু শব্দ একার্থক তাহার স্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান মাত্র জ্ঞ'ন শব্দ ও চিৎ শব্দ একার্থক যাহার কখন বাধ নাই অর্থাত অভাব নাই তাহাকে সত বলি তাহাও ব্রহ্ম ব্যাতিরেকে অন্য কেহো নয় অতএব সচ্চিত এই দুই শব্দের একই অর্থ একার্থক। এই প্রযুক্ত সর্ব্বশাস্ত্র ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ করিয়া কহেন তিনিই অনন্ত যেহেতুক তাঁহার অন্ত নাই তিনিই অদ্বয় যেহেতুক তাঁহার ওন্য দ্বিতীয় বস্তু নাই অতএব সচ্চিদানন্দ অনন্ত অদ্বয় যে ব্রহ্ম তিনিই বস্তু।"

অনুবাদক বর্ণনা প্রিয়। বেদান্তসারের জটিল দর্শন আলোচনায় বর্ণনা সুযোগ অল্প। তবু যেটুকু সুযোগ পেয়েছেন তিনি তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এই বর্ণনা সংস্কৃত রীতিতে ঝঙ্কার বহুল শব্দ সমন্বয়ে অলঙ্কৃত ও বর্ণাঢ্য। ভূমিকায় কলিযুগের দুর্মতিগ্রস্থ মানুষের আচরণের বর্ণনায়, দুঃসাধ্য কর্মযোগের পথ বর্ণনায়, ৮ এর পাতায় সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের বর্ণনায়, শেষাংশে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বর্ণনায় অনুবাদকের এই শব্দালঙ্কার প্রধান বর্ণনাপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বর্ণনাপ্রিয়তাই তাঁর অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগের কারণ। 'যেহেতুক' ও 'কিনা' শব্দদুটির অত্যধিক ব্যবহার এই রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য। "ভূমির উদ্ভেদ কিনা বিদারণ করিয়া হয় যে লতা বৃক্ষাদি তাহাকে উদ্ভিদ করিয়া বলি।" 'করিয়া' এই বাড়তি ক্রিয়া পদের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দবহুল শব্দের মধ্যে হঠাৎ চলতি ভাষার দুএকটি শব্দের ব্যবহার প্রায়ই চোখে পড়ে যেমন, 'কর্য্যা, লখিতেছে, তাকে, ভেল্কি, তাতে' ইত্যাদি। পুঁথির শেষ লাইনে 'তরজমা', এবং ভূমিকায় সাহেব' শব্দ দুটি বিদেশী শব্দ।

সমগ্র পুঁথিটিতে মোট দুরকমের হস্তাক্ষর পাওয়া যায়। পুঁথির ১৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির হস্তাক্ষর। এখানে আধুনিক ছাঁদের অক্ষর যেমন, 'অ', 'আ', 'ল' প্রভৃতি দেখা যায়।

বাকী আর সব পাতায় পুরানো ছাঁদের অক্ষরে লেখা। পুঁথির ভূমিকায় ১৮০৩ সালে 'অমুকনামা বড় সাহেবের অধিকার সময়ে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অমুক নামা বড় সাহেব কে? লেখক তা বলেন নি। বড় সাহেব বলতে তিনি উইলিয়াম কেরী কে বুঝিয়েছেন কি না বোঝা যায় না। শ্রীরামপুরের মিসনারীদের, শ্রীরামপুরের ডেনিসদের, বাংলা দেশের ইংরেজদের—কাদের বড় সাহেবকে লেখক উল্লেখ করেছেন তা অস্পষ্ট। লেখক কেরীর খুব কাছের মানুষ, তাঁকে 'বড় সাহেব' বলে মনে করা শ্রীরামপুরে মিশনে কর্মরত কোন পণ্ডিতের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

রাজা রামমোহন রায়ের বেদান্ত আলোচনায় প্রবেশ করতে তখনও এক যুগ বাকী। উনিশ শতকের সেই অতি প্রত্যুষেই কেরী বা ওয়ার্ডের অনুরোধে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বাংলার বৈদান্তিক পণ্ডিতদের কেউ এই বেদান্তসার রচনা করেছেন। বাংলাভাষা সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাশীল উইলিয়াম কেরী বাংলা গদ্যকে গড়ে তোলার যে বিরাট কর্মযজ্ঞের সূচনা করেন এই অনুবাদক ছিলেন সেই কর্মযজ্ঞের অন্যতম সহায়ক। তাঁর এই ক্ষুদ্র কিন্তু অসাধারণ প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের যথাযথ মূল্যায়ণ আজ আমাদের করতে হবে।

—*—

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে—

একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি

বেদান্তসার

উহার মূল সংস্কৃত ও তার সমসাময়িক

ইংরেজী অনুবাদ সমেত।

শ্রীরামপুর কলেজ কাউন্সিল

শ্রীরামপুর ৭১২ ২০১

পশ্চিমবঙ্গ

বাংলা গদ্য পুঁথি সম্পর্কে আলোচনা সভা

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২, শনিবার শ্রীরামপুর কলেজের কেরী গ্রন্থাগারের উদ্যোগে বাংলা গদ্য পুঁথির ওপর একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং বক্তব্য রাখেন ডা: চিত্রা দেব, ডাঃ পূর্ণেন্দু নাথ, অধ্যাপক গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল এবং শ্রীপ্রণব দেব।

আলোচনা সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় বলেন সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বাংলা পুঁথির ব্যবহার এবং বাংলা গদ্যের উদ্ভব সম্বন্ধে সংশয় নিরসনের প্রতি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই সভার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। বাংলা পুঁথি সম্পর্কে ডাঃ চিত্রা দেব বলেন ইহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসের উপাদানের মূল্যবান আকর। পুঁথি পাঠের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পুঁথি পাঠের নানা বৈচিত্র এবং বিভিন্ন পুঁথির বিভিন্ন আক্ষরিক সংগঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল বলেন পুঁথি পাঠের প্রমাদের জন্য অনেক সময় নানা বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাপক গোবিন্দদেব ভট্টাচার্য কেরী গ্রন্থাগারের একটি দুষ্প্রাপ্য বাংলা গদ্য পুঁথি বেদান্তসারের অবস্থিতির কথা জানিয়ে বলেন বাংলা গদ্যের উদ্ভব এবং বাংলায় বেদান্ত চর্চা সম্বন্ধে এই পুঁথিটি নতুন আলোক পাত করবে। শ্রীরামপুর কলেজ পুঁথিটি মুদ্রণের আয়োজন করছে। শ্রীপ্রণবকুমার দেব বেদান্তসার সম্পর্কে বলেন পুঁথিটির সরল ও সুবোধ্য ভাষা উনিশ শতকের প্রথম দশকে বলিষ্ঠ বাংলা গদ্যের উপস্থিতির কথা জানায়।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ ডাঃ শৈলেশ মুখোপাধ্যায় ডা: উষা মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শরদিন্দু ভট্টাচার্য, ডা: বিধানবরণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক প্রতাপ বিশ্বাস, অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা করুণা বসাক, শ্রীশৈলধর দে প্রমুখ সুধীবৃন্দ।

আলোচনার উপসংহার করে ডাঃ অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও গবেষণায় পুঁথি পাঠের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

শ্রীরামপুর কলেজের বাংলাবিভাগের প্রধান অধ্যাপক পঞ্চানন ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সামাজিক ইতিহাসের উপাদানরূপে পুঁথি

ডঃ চিত্রা দেব

কোন দেশের সামাজিক ইতিহাস লেখার সময় ঐতিহাসিক এবং গবেষকরা সে দেশের মুদ্রা, শিলালিপি, তৈজসপত্রের টুকরো, ব্যবহৃত জিনিষপত্র, পর্যটকের বিবরণ প্রভৃতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেন। এদের সাহায্যেই আমরা অতীতের অনেক কথা জানতে পারি। শুধু রাজা রাজড়ার কথা নয়, নাগরিক জীবনের সুখ দুঃখ, ভাল লাগা, ভালবাসার কথাই জানা যায়। জানা যায় সাধারণ মানুষ কেমন জীবন যাপন করতো, মেয়েরা কি কি অলংকার পরতো, শিশুরা কিভাবে লেখাপড়া শিখতো ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে সমসাময়িক সাহিত্য থেকেও সামাজিক ইতিহাসের নানারকম তথ্য সংগৃহীত হয়। কিন্তু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসাবে পুঁথিকে বোধ হয় কখনও গ্রহণ করা হয় না। অথচ জরাজীর্ণ পুঁথির পাতায় এখনও পুরনো দিনের এমন অনেক খবর লুকিয়ে আছে যার মূল্য আমাদের ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদের কাছে অপরিসীম। বিশেষ করে বিগত দুশো তিনশো বছরের পুরনো কথা জানতে হলে আমাদের পুঁথি পত্রের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। পোড়া মাটির মন্দিরে, কাঠের খিলানে, টেরাকোটার কাজে কিংবা দলিল দস্তাবেজে তৎকালীন সমাজের যেটুকু ছবি পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশী খবর মেলে তালপাতা ও তুলোট কাগজের ওপর হাতে লেখা পুঁথি মন দিয়ে পড়লে। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের রীতিনীতি, ধর্মপ্রবণতা, শিক্ষা, জীবিকা এমন কি সেকালের বাজারদর ও আরো এমন অনেক কথা পুঁথির পাতায় লুকিয়ে রয়েছে যা সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে।

অবশ্য সব পুঁথিতেই যে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যায় তা নয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথির সংখ্যাই বোধ হয়

কয়েক হাজার হবে। পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বাংলাদেশেও তার কম হবে বলে মনে হয় না। এছাড়া আছে বিভিন্ন দেশে ছড়ানো ছিটানো বহু পুঁথি। ব্যক্তিগত সংগ্রহে শহরে গ্রামে কোথাও অযত্নে কোথাও বা অতি যত্নে হিসেব বহির্ভূত বহু পুঁথি রয়েছে। এই হাজার হাজার পুঁথির মধ্যে সব পুঁথিই যে সমান প্রয়োজনীয় তা নয়। বাংলা পুঁথির সঙ্গে রয়েছে বহু পরিমাণে সংস্কৃত পুঁথি। এসব পুঁথির সঙ্গে বাঙালী সমাজের কোন যোগ নেই। শুধু মধ্যযুগের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘরে কী পরিমাণ সংস্কৃত পুঁথি থাকতো তার হদিশ মেলে। সেকালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরাই সংস্কৃত পুঁথির চর্চা রেখেছিলেন। অনুরূপভাবে বহু আরবী ফারসী গ্রন্থের হুবহু তরজমা হয়েছিল। সেগুলিতেও আমরা বাঙালী সমাজের কিছু পাই না। এই বিপুল সংখ্যক পুঁথি বাদ দিয়ে শুধু মাত্র বাংলা পুঁথি থেকেই মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এদের মধ্যে আছে বহু সংখ্যক অনুলিপি। সেকালে মুদ্রণযন্ত্র ছিল না, বই ছাপা হত না, হাতে নকল করে কাজ চালাতে হত, তাই মূল গ্রন্থের বহু অনুলিপি করা হত। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও কবিচন্দ্রের অজস্র পুঁথি আমাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে কিন্তু তাঁর মধ্যে অনুলিপির সংখ্যাই বেশি।

তবে যে কোন বাংলা পুঁথিই বোধ হয় সমাজতাত্ত্বিকের কাছে মূল্যবান। কারণ পুঁথি পত্র থেকে সমাজ জীবনের পরিচয় সংগ্রহ করতে হলে অনুসন্ধান করতে হবে দুদিক থেকে। প্রথমতঃ, পুঁথি-আশ্রয়ী কাব্য পাঁচালী থেকে সমসাময়িক জীবনযাত্রার পরিচয় সংগ্রহ হবে। দ্বিতীয়তঃ, পুঁথির পুষ্পিকা অর্থাৎ লিপিকারের লেখা বিবরণ থেকে তা পাওয়া যাবে। সাধারণতঃ এই অংশ থাকে পুঁথির শেষ পাতায়। গবেষক এবং পুঁথি বিশেষজ্ঞরা এই অংশে চোখ বোলান শুধু পুঁথি রচনার সাল তারিখ জানার জন্যে। কিন্তু অনেক সময় সেখানে লিপিকারের দেওয়া কিছু খবরও থাকে। এই খবর কিন্তু

সাহিত্যের খবর নয়, শুধুই সংবাদ। তাই মনে হয় বাংলা পুঁথি আমাদের সামনে সেকাল অর্থাৎ মধ্যযুগকে উপস্থিত করে দুভাবে—সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ও পুষ্পিকার মধ্য দিয়ে। পুষ্পিকা-সংবাদ অনেকটা ডায়রী লেখা।

প্রথমে সাহিত্যিক উপাদানের বিচার করা যাক। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সাহিত্যই সমাজের দর্পণ, সাহিত্যিক সামাজিক মানুষ। সমাজ থেকেই তিনি সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেন। মধ্যযুগে নিজের কথা বলার রেওয়াজ ছিল না। কবিকে দেবতার নামে মানুষের কথা বলতে হত। তাই 'রাধার কি হৈল অন্তরের ব্যথা' বলে চণ্ডীদাস ডুব দিয়েছেন আপন মনের গহনে। মুকুন্দরাম বাংলাদেশের ঘোর নৈরাজ্যের কথা এঁকেছেন পশুদের দুঃখের রূপকে। সাধারণ মানুষের আকাঙ্খা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' ভারতচন্দ্রের ঈশ্বর পাটনীর প্রার্থনার সঙ্গে মিশে আছে। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবার সময় মায়ের ছোট্ট প্রার্থনা 'আঁটু ঢাকা বস্ত্র দিও পেট ভরা ভাত' মেনকার জবানীতে শুনিয়েছেন রামেশ্বর। চর্যাপদের সময় থেকে দীর্ঘ হাজার বছর ধরে এভাবেই বাংলাসাহিত্য থেকে খুঁজে নিতে হয়েছে প্রকৃত সামাজিক অবস্থাটিকে। এই দীর্ঘ সময়ে লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য জীবনী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী থেকেই আমরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কথা জানতে পারি। এসব কাব্য পাঁচালীর মধ্যে নতুনত্ব কিন্তু কবিদের সামাজিক পরিবেশে। এর বদলের ছাপ কবিদের ওপর পড়েছে। একই মনসামঙ্গল নারায়ণদেবের হাতে এক রকম আবার কেতকীদাসের হাতে আরেক রকম লেখা হয়েছে। পুঁথি পড়ে বোঝা যায় কোন কবির রাজসভায় যাতায়াত ছিল আর কে কুঁড়ে ঘরে বসে কাব্য লিখতেন। রামায়ণ-মহাভারত লেখবার সময় কারুর কাব্যে স্বর্ণলঙ্কা গ্রাম বাংলার ফুলিয়ায় পরিণত হত। কারুর কাব্যে

বিরাট রাজার সভা তৈরি হত মোগলের করদরাজ্য বিষ্ণুপুরের আদলে। এদের মধ্যে থেকেই আমাদের খুঁজে নিতে হয় সমাজের খণ্ড খণ্ড চিত্র কখনও রূপকের আড়ালে, কখনও প্রতীকের ব্যঞ্জনায়।

এতো গেল একদিকের কথা। অপর দিকে অর্থাৎ পুঁথির পুষ্পিকা থেকে যে সামাজিক তথ্য আহরণের কথা বলেছি তার গুরুত্বও কম নয় বরং অনেক বেশি। লিপিকারেরা কবি নন, নকলচিমাত্র। তবু তারই মধ্যে কেউ কেউ লিখেছেন নিজেদের মনের কথা, দেশের কথা কিংবা বিশেষ কোন ঘটনার কথা। কেউ লিখেছেন, 'সর্বসুখে নৈরাশ এই মোর ললাট' কেউ লিখেছেন, 'ছেয়াসী সালে ইজারা করিয়াছিলাম যে গ্রামে সেই গ্রামে টোটা পড়িয়াছিল। সেই টোটার দায়ে পলাতক অঙ্গরোলে গিয়াছিলাম। তাহাতে এই পুঁথি বসিয়া লিখিলাম।' কেউ লিখেছেন, 'এই সম্বৎসরে দো আশ্বিনী হৈবাতে শ্রীশ্রীদুর্গোৎব কাশী ও নদীয়ায় পণ্ডিতদের বেবস্থা অনুসারে বাংদেশি ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থ সকলে কার্ত্তিক মাসে পূজা করিলেন উড়িষ্যা দেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজীর মন্দিরে। শ্রীবিমলা ঠাকুরানের পূজা দো আশ্বিনীর বিধান না মানিয়া পূর্বানুসারে আশ্বিন মাসে ১৬ দিন পূজা করিয়া দশেরা করিলেন। সন ১২৩০। আবার কেউ লিখেছেন, 'শকাব্দা ১৬৭৯ সুবেদারী নবাব সিরাজদ্দৌলার ফৌতী তারিখ ১৮ আষাঢ় ১১৬৪' এদের কোনটাই লিপিকারের লেখার কথা ছিল না তবু তাঁরা পুঁথির শেষ পাতায় নিজের নাম ধামের সঙ্গে লিখে রেখেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রথম দুটি ব্যক্তিগত সংবাদ কিন্তু একটি লিপিকারদের নিজস্ব দুর্ভাগ্যের কথা, দুঃখ কষ্টের মধ্যেই এই জীবিকাশ্রয়ী মানুষের দিন কাটত। দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত সংবাদ হলেও ৮৬ সালের দুর্ভিক্ষের উল্লেখ গ্রাম থেকে পলাতক মানুষের ভিন্ন জীবিকাগ্রহণের কথা রয়েছে। এ সংবাদ অর্থনীতিবিদের কাছে মূল্যবান। তৃতীয় পুষ্পিকা পাঠে বোঝা যাচ্ছে 'পূজার বিধান' নিয়ে পণ্ডিতদের মতানৈক্য হয়েছিল এবং নবদ্বীপ ও কাশীর পণ্ডিতরা একমত

হননি। আর চতুর্থ পুষ্পিকাটি ইতিহাসের মূল্যবান সাক্ষী। সিরাজ-দ্দৌলার মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করে লিপিকার নিজের অজ্ঞাতেই একটি বিরাট্ কাজ করেছেন। সিরাজের মৃত্যুর কদিন পরই এই পুঁথি লেখা শেষ হয়েছে তাই এত বড় ঘটনার উল্লেখ না করে লিপিকার পারেননি। এখানে পুষ্পিকাটি সমসাময়িক বিবরণ হিসাবে সকলের কাছেই দামী। কিন্তু সামাজিক ইতিহাসের উপাদানরূপে এই পুষ্পিকাগুলিকে যখন বিচার করা হবে তখন সম্মিলিতভাবে তারা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবে বিগত শতাব্দীর একটি সামগ্রিক চিত্র। বিগত দুশো আড়াইশো বছরের বহু খবরই পুঁথির মধ্যে পাওয়া যাবে। সে যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক পরিস্থিতির কাঠামোটিও অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা দেখতে পাব আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব অনেকখানি। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, আমরা মনে করি আগেকার দিনে লেখাপড়া শিখতেন শুধু ব্রাহ্মণরা, পুজো এবং পাঠশালা নিয়েই তাঁদের দিন কাটতো। আর সাধারণ মানুষ অর্থাৎ শ্রমজীবি সমাজ—যাঁরা চাষ করতেন, মাছ ধরতেন, কাপড় বুনতেন, কি কাপড় কাচতেন তাঁরা সবাই ছিলেন অক্ষর পরিচয়হীন নিরক্ষর। কিন্তু পুঁথির শেষ পাতায় পুঁথির পাঠক হিসেবে আমরা দেখতে পাই চাষী, জেলে, তাঁতী, ধোপা, কলু, দরজী, কামার, কুমোরের সংখ্যাই বেশি। এরাই বাংলা পুঁথি পড়তেন, পয়সা খরচা করে লেখাতেন, কিনতেন, যত্ন করে তুলে রাখতেন। ধোপার উঠোনে চাষীর দরজায়, কামারের বাড়ির পাশে পাঠশালা বসত। সুতরাং আমাদের ধারণার অনেকটাই যে ভ্রান্ত তাতে সন্দেহ কী? এ রকম আরো বহু ধারণাই বদলে যেতে পারে পুঁথির পাতায় চোখ বোলালে। সুতরাং সামাজিক ইতিহাসের উপাদানরূপে পুঁথিকে মোটেই অবহেলা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কেন পুঁথিকে সব সময় মূল্যবান উপাদান হিসেবে প্রমাণ করা হয় না? সঠিক কারণ আমাদের জানা

নেই তবে অনুমান, এর পেছনেও আছে কয়েকটি গড়ে ওঠা ধারণা। প্রাপ্ত পুঁথির বর্ণমালার সঙ্গে অপরিচয়ের দরুণ অনেক সময় পাঠ বিভ্রান্তি ঘটে। হস্তলিপি খারাপ হলে অনেক পুঁথি পড়া কষ্ট কর হয়ে ওঠে। পুঁথি সংগ্রাহকরাও অনেক সময় বুঝতে পারেন না পুঁথি জাল না আসল। কিছু কিছু স্বার্থপর ব্যক্তি পুঁথি জাল করেন। প্রাচীন পুঁথির দাম বেশি তাই সন তারিখে কালি দিয়ে জাল তারিখ লেখা হয়। তাতে সমস্ত ধারণা বদলে যায় ও ঐতিহাসিক কাল পরম্পরায় ভ্রান্তি দেখা দেয়। এসব কারণে সামগ্রিক ভাবে পুঁথি পাঠের ওপর আমাদের অনীহা এসে গেছে। পুঁথিকে উপাদনা রূপে গ্রহণ করতেও ভয় করে।

তবু পুঁথিকে বাদ দিয়েও কাজ চলতে পারে না। পুঁথির মাধ্যমেই আমরা পাই সেকালের সাহিত্য ও সমাজের নানান বৃত্তান্ত। বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় সেখানকার ভাষারীতি প্রচলিত সাল বা অব্দ, স্থানীয় ভূস্বামীর নাম সবই আমরা পুঁথির মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি করে পাই। আর পুঁথির পুষ্পিকায় পাই দুশো আড়াইশো বছর আগেকার সাধারণ মানুষের কথা, তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না ভরা জীবনের টুকরো টুকরো ছবি কেউ দুর্ভিক্ষের সময় ঘর ছেড়ে পুঁথি লিখছে, কেউ রোগ ভয়ে পালিয়ে এসেছে বাড়ি-ঘর-আত্মীয়-পরিজন সবাইকে ফেলে, কেউ অনাথ শিশু, মামার বাড়িতে বসে পুঁথি লিখেছে, আবার কেউ লিখছে মহানন্দে, নাম থাকবে বলে। এই সব সাধারণ মানুষের কথা ইতিহাসে লেখা থাকে না, পর্যটকের বিবরণে কিংবা রাজ সভাকবির রচনাতেও নয়, এদের কথা জানা যাবে সম-সাময়িক ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে কিছু কিছু দলিল দস্তাবেজে আর বাংলা পুঁথির পুষ্পিকায়। সুতরাং বাংলার সামাজিক ইতিহাস চর্চায় পুঁথির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাকে বাদ দিয়ে কাজ করলে প্রকৃত সত্য কখনোই উদঘাটিত হবে না। তবে তার জন্যে সর্তকতা প্রয়োজন এবং তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন সর্বপ্রকার গোঁড়ামি বর্জিত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির।

Books Published by the Council of Serampore College
Now available

Carey Library Pamphlets : Catalogue (Secular Series)
Miss K. S. Diehl

Early Indian Imprints : Catalogue (Booklet)
Miss K. S. Diehl

India's Carey : A Play
Mr. E. P. Jacob

Raja Rammohan Roy and his contemporaries : Catalogue
Sri S. Chatterjee

Missions in India : Catalogue
Sri S. Chatterjee

Plan and Sequel : Carey Lecture
Dr. W. Stewart

Carey Library Pamphlets : Catalogue (Religions Series)
Sri S. Chatterjee

Carey Day Souvenirs—1979, 80, 81 : Seminar Papers

Please enquire to :

The Incharge, Carey Library
Serampore College
Serampore 712 201
West Bengal, India.